## MAQAM : Center For Sufi Heritage

৭/১৫, আজিজ মহল্লা, ব্লক এফ, জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭


---

# চট্টগ্রামের সুফিদের সংগ্রামী ঐতিহ্য: জুলাই অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পরম্পরা


## তৌহিদুল ইসলাম



**কি-ওয়ার্ড**

সুফি, জুলুম, মজলুম, রুহানিয়ত, সংগ্রাম, ইনসাফ, পরম্পরা


**পারিভাষিক ব্যাখ্যা:**

**রুহানিয়ত:** আরবি শব্দ রুহ (আত্মা/স্পিরিট) থেকে উদ্ভূত। অর্থ আধ্যাত্মিকতা। পরিভাষায়, এটি এমন এক চেতনা বা জীবনদৃষ্টি, যা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারের বাইরে গিয়ে অন্তরাত্মার পরিশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন এবং আত্মিক-আদর্শিক সংযোগকে প্রাধান্য দেয়।

**রুহানিয়তভিত্তিক প্রতিরোধ/রাজনীতি:** এমন এক প্রতিরোধচেতনা বা রাজনৈতিক অবস্থান, যা মানুষের মর্যাদা, ইনসাফ ও আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যার ভিত্তিতে রুহানিয়ত, প্রয়োগে ইনসাফ (ন্যায়বিচার), উদ্দেশ্যে রয়েছে জুলুম ও অসাম্যের প্রতিকারে এক ধার্মিক প্রতিশ্রুতি।

**জুলাই অভ্যুত্থান:** ২০২৪ সালে সংগঠিত স্বৈরাচারী আওয়ামী শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান।

**অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ:** একটি শক্তিশালী দেশ কর্তৃক অন্য একটি দুর্বল দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করা বা শোষণ করা। এই উপনিবেশবাদে সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আধিপত্য বিস্তার করা হয়।

**সামুদ্রিক সাম্রাজ্যবাদ:** রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সমুদ্রপথ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

**ভূমিকা:** বাংলার ইতিহাসে চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় স্থান, যেখানে নানা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধচেতনা একসাথে গড়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এই বন্দরনগরী বহু শতাব্দী ধরে বাংলা অঞ্চল ও ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছিল। এর ফলে চট্টগ্রামে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং আদিবাসী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, যা অঞ্চলটির সমাজ ও চিন্তায় গভীর প্রভাব রেখেছে। তবে এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি চট্টগ্রামের ইতিহাস আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা বহন করে। তা হলো শাসন, উপনিবেশ, সাম্রাজ্য এবং একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ কেবল রাজনৈতিক নয়; এটি এক ধরনের আত্মিক ও চিন্তাগত দৃষ্টিভঙ্গির ফল, যার ভিত্তি ছিল রুহানিয়ত। এখানে আত্মশুদ্ধির সাধনা আর সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে; আলাদা বিষয় হিসেবে নয়। এই রুহানিয়ত-ভিত্তিক চেতনা ঐতিহাসিকভাবে উপনিবেশবাদ ও শ্রেণিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক সচেতন অবস্থান তৈরি করেছে। শ্রমজীবী, কৃষক, ছাত্র ও প্রান্তিক মানুষের স্বাধীনতা এবং মর্যাদার প্রশ্নকে আত্মিক দায়িত্ব হিসেবে দেখিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সুফিদের ভূমিকা ছিল খুবই কার্যকর। তাঁরা শুধু আধ্যাত্মিক গুরু নন; বরং জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শিক্ষক। যাঁদের শিক্ষা, জীবনাচার ও সাংগঠনিক ক্ষমতা যুগে যুগে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে। এই রুহানিয়তনির্ভর সংগ্রামের ধারাবাহিকতা দেখা যায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে, আবার পাকিস্তানি সামরিক দমননীতির বিরুদ্ধেও। এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশের ভেতরেও যখন রাষ্ট্র দমনমূলক ও বৈষম্যমূলক আচরণ করে, তখনও এই চিন্তা জনগণের প্রতিবাদের ভিত হিসেবে কাজ করেছে। এই ধারাবাহিকতার একটি সাম্প্রতিক পরিণতি হলো ২০২৪ সালের 'জুলাই অভ্যুত্থান'। এটি কেবল তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়; বরং চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশের রুহানিয়ত ও ইনসাফ-নির্ভর সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণ বুঝতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে চট্টগ্রামের সেই সুফি ঐতিহ্যের দিকে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আত্মসংযম, প্রতিরোধ এবং সত্যের পথে দৃঢ় থাকার ভাষ্য গড়ে তুলেছে।

# চট্টগ্রামের সুফিদের সংগ্রামী ঐতিহ্য

বাংলার মাটিতে সুফিদের আগমন ঘটে দশম শতকের দিকে। সে সময় এখানকার সমাজ ও শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণপ্রথাকে ভিত্তি করে। যেখানে জন্মের ভিত্তিতে মানুষকে শ্রেণিতে ভাগ করা হতো। এই কাঠামো শুধু ধর্মের নয়; বরং এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে অধিকারের চেয়ে বঞ্চনা আর মর্যাদার চেয়ে অবজ্ঞা বেশি ছিল। ইসলামের যে তাওহিদের বাণী, ইনসাফের দাওয়াত এবং মর্যাদাভিত্তিক সমাজগঠন– তা এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক শাসক ও পুরোহিত শ্রেণির সঙ্গে স্বভাবতই পরস্পর বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাই ইসলাম এই অঞ্চলে শুধু একটি নতুন ধর্ম হিসেবে আসেনি; বরং তা ছিল জুলুমের বিরুদ্ধে এক নতুন চিন্তা। যা সমাজের নিম্নবর্গের মানুষকে কথা বলার সাহস যুগিয়েছে। এই দাওয়াত ও আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সুফিরা। তাঁরা নিপীড়িতদের সামনে এক নতুন পথের দরজা খুলে দেন, যেখানে শ্রেণি নেই, জাত নেই, আছে শুধু আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানুষের সম্মান ও দায়িত্ব। এই দাওয়াত কেবল নামাজ-রোজার শিক্ষা নয়; বরং এক মুক্তির ডাক। যেখানে মানুষ আত্মমর্যাদা ফিরে পায়, সমাজে নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আর জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখে। সুফিদের এই বার্তা এমন সময় এসেছিল, যখন সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ছিল অবহেলিত, পেছনে ফেলে দেওয়া, অনগ্রসর। ফলে ইসলাম এখানে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব নয় বরং আত্মিক মর্যাদা, মানবিক ইনসাফ ও রুহানিয়তভিত্তিক জীবনের এক নতুন দিগন্তের আহ্বান। ইতিহাসবিদ রিচার্ড এম. ইটন এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, নিপীড়ক উচ্চবর্ণের হিন্দুদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ। এমতাবস্থায় সুফি শেখদের প্রচারিত সামাজিক সাম্যের বার্তা এই নিপীড়িত জাতিগুলির কাছে মুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।"[১]

কেউ কেউ ইটনের এই বিশ্লেষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু ইতিহাসে সুফিদের ভূমিকা, তাদের প্রতি জনগণের সমর্থন এবং তাঁদের প্রভাব যে দীর্ঘস্থায়ী ছিল– তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, ইবনে বতুতা তাঁর বিবরণে সিলেটে শাহ জালালের দরবারে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, সুফিদের দরবার ছিল সব শ্রেণির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। কারণ, তাঁরা মানুষকে জুলুম থেকে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। আকবর আলি খান তাঁর গবেষণায় সুফিদের রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নানা দিক তুলে ধরেছেন। তবে তিনি এই প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দেননি যে, কেন এই সংগ্রামী সুফিদের বিরুদ্ধে জনরোষ দেখা যায়নি? কেন বিজয়ের পরও তাঁদের দরবারে ভিন্ন ধর্মের মানুষও আসতেন?[২] এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের বুঝিয়ে দেয়– বাংলার সুফিরা শুধু ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, তাঁরা সমাজে সমতা, আধ্যাত্মিক প্রতিরোধ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতীক হয়ে ওঠেন। তাঁরা রাজা বা শাসকের পক্ষে ছিলেন না; ছিলেন মানুষের পক্ষে। সর্বোতভাবে জুলুমের বিরুদ্ধে।

চট্টগ্রামে সুফি আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ রূপ নেয়। এটি প্রথমে প্রান্তিক মনে হলেও, পরে রাজনৈতিকভাবে গভীর তাৎপর্য অর্জন করে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় প্রধান রুট হিসেবে চট্টগ্রাম ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে আরব, পারস্য ও তুর্কি সুফিদের প্রবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ দরজা। যদিও অষ্টম-নবম শতক থেকেই মুসলিম ব্যবসায়ী ও সুফিরা এ অঞ্চলে আসা শুরু করেন, ইসলাম এখানে কেবল বাণিজ্য কিংবা ধর্মান্তরের মাধ্যমে টিকে যায়নি। বরং, ইসলামের বিস্তার এখানে হয়েছে একধরনের আত্মিক জাগরণ ও শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থানের মাধ্যমে। এই অঞ্চলে সুফি-সাধকদের কার্যক্রম শুধু নামাজ-রোজার আহ্বান ছিল না; তা ছিল এক ধরনের সমাজ বদলের শিক্ষা, যেখানে আত্মশুদ্ধির পথ সমাজে ইনসাফ কায়েম করার লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িত। সুফিদের দরবার ছিল সেই প্রান্তিক মানুষদের আশ্রয়, যাদের ভাগ্যে না ছিল মাটি, না ছিল আহার, কিন্তু আত্মমর্যাদার স্বপ্ন কখনও ছাড়েনি। এই দরবারগুলোতে মানুষ শুধু দান-খয়রাত পেত না, তারা নিজের ভিতরে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেত, যা তাকে জুলুমের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখাত। চট্টগ্রামের সুফিরা তাঁদের দরবারকে কেবল আচার-অনুষ্ঠানের জায়গা হিসেবে গড়ে তোলেননি; বরং তাঁরা এগুলোকে বানিয়েছিলেন এমন কেন্দ্র, যেখানে এক বিকল্প সমাজব্যবস্থার চিন্তা গড়ে ওঠে। এখানে শাসকের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা শাসকের কাছে বৈধতা পাওয়ার প্রতীক্ষাতেও ছিলেন না, কারণ তাঁদের রুহানিয়ত নিজেই এক ধরনের নৈতিক কর্তৃত্ব ছিল। এই কর্তৃত্ব ছিল করুণা, ইনসাফ এবং তাওহিদের বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মানুষ তার নিজের মর্যাদা, দায়িত্ব ও অধিকার বুঝতে শিখতো। এই রুহানিয়ত নিছক সাধনার বিষয় ছিল না, এটা ছিল এক বাস্তব হাতিয়ার, যা মজলুমদের সাহস দিত, আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলত এবং শোষণের শিকল ভাঙার পথ দেখাত।

এই ঐতিহাসিক ধারার গভীরতা বুঝতে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা চট্টগ্রামে সুফিদের নেতৃত্বে ও অংশগ্রহণে সংঘটিত চারটি প্রধান প্রতিরোধ পর্ব বিশ্লেষণ করবো। এসব পর্বে দেখা যাবে কীভাবে সুফিরা মানুষকে সাহস দিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন, এবং ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়ার পথে পথপ্রদর্শক হয়েছেন। এই সংগ্রামী ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেবে, চট্টগ্রামের রুহানিয়ত শুধু আধ্যাত্মিকতা ছিল না; তা ছিল ইতিহাস বদলের এক প্রেরণা।

---

[১] *The Rise of Islam and Bengal Frontier, 1204-1760*: Richard M. Eaton, University of California Press, London, 1993, 73-80

[২] *বাংলাদেশের সতার অন্বেষা*, আকবর আলি খান, আমিনুল ইসলাম ভুইয়া অনুদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, ৮৮-৯৪

## প্রথম পর্ব (সুলতানি আমল)
## (সুফি-প্রতিরোধের গোড়াপত্তন: কদল খান গাজি ও বারো আউলিয়া)

**কদল খান গাজি:** প্রচলিত বয়ান অনুযায়ী তিনি সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৪৯) সেনানায়ক হিসেবে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তবে ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম তাঁর 'সেনানায়ক' পরিচয়কে সরাসরি মেনে না নিয়ে বরং তাঁকে স্বতন্ত্র সুফি-মুজাহিদ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন, যিনি জুলুমের বিরুদ্ধে কেবল কথা বলেননি; বরং প্রতিরোধে অস্ত্রও তুলে নিয়েছিলেন।[৩] কদল খান ছিলেন প্রথম মুসলিম, যিনি চট্টগ্রাম বিজয় করেন।[৪] ইতিহাসের পাতায় তার নাম যতই আবছা হোক, কিন্তু পীরসংক্রান্ত কিসসা এবং আঞ্চলিক জনস্মৃতিতে তিনি অম্লান হয়ে আছেন 'কাতাল পীর' নামে। যিনি সামন্তশ্রেণির লুণ্ঠন, দাসব্যবসা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে একসাথে রুহানিয়ত ও রণশক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। কদল খানের সঙ্গে হাজী খলিল পীর, বদরুদ্দিন আউলিয়াসহ বারো জন সুফির আগমন ঘটে, যাঁরা সমবেতভাবে পরিচিত হন 'দাওয়াজদাহ আউলিয়া' নামে। তাঁরা শুধু আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ছিলেন না; হয়ে উঠেছিলেন মজলুম জনগণের পক্ষ থেকে শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক সংগঠিত শক্তি। এই সুফিরা স্থানীয় নিপীড়িত জনগণকে সাথে নিয়ে মগ ও আরকানিদের সমর্থিত 'লুটেরা শক্তি'র বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। গণহত্যা ও দাসব্যবসার মতো জঘন্য জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁরা যে বলয় তৈরি করেন, সেটি কেবল আত্মরক্ষামূলক ছিল না; বরং ইনসাফভিত্তিক এক বিকল্প সমাজচিন্তার সূচনা। এই প্রতিরোধ এখানকার মানুষকে দেখিয়েছে– ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত নয়; ইসলামের রুহানিয়ত মানুষের সম্মান ও স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত। এই ব্যতিক্রমী অবস্থানই মজলুম জনগণের নিকট ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও এর গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।[৫]

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম এবং এর উপকূলীয় অঞ্চল ছিল গভীর সংকটে। আরকানি রাজাদের সহায়তায় মগ শ্রেণি সারা উপকূলে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং মানুষ পাচারের নৃশংসতায় জড়িয়ে পড়ে। বিদেশি বাজারে হাজার হাজার মানুষকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়, জনপদ পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়, বাণিজ্যপথ প্রায় অচল হয়ে পড়ে। এই সংকটই ডেকে আনে কদল খান গাজীর নেতৃত্বে এক সুফি-প্রতিরোধের উত্থান। তিনি এত বড় পরিসরে দস্যু ও জালিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন যে, জনগণের মুখে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন 'কাতাল পীর'[৬] – (কারণ, তিনি জুলুম দমন করেন কতল বা জালিমের শিরশ্ছেদের মাধ্যমে)। এই উপাধি শুধু একটি যুদ্ধকৌশলের প্রতীক নয়; বরং তা হয়ে ওঠে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অটল অবস্থানের প্রতিচ্ছবি।[৭] চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জ (বর্তমান পাঁচলাইশ) ও কদলপুর (রাউজান) এলাকার নামকরণও তাঁর স্মৃতিকে বহন করে।[৮]

**শাহ ওমর (রহ.):** সুলতানি আমলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-পর্ব গড়ে ওঠে শাহ ওমরের নেতৃত্বে। ঐতিহাসিক বিবরণ ও লোককথা অনুসারে, তিনি ছিলেন হজরত শাহ জালালের সফরসঙ্গী এবং তাঁর দাওয়াতি ধারার ধারক। বাংলায় আগমনের পর তিনি চকরিয়ার কাকারা অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে তৎকালীন স্থানীয় শাসক বীর কামাল এক ভয়ংকর জুলুম ও স্বৈরাচারের নজির স্থাপন করেছিল। এতে শাহ ওমরের প্রতিরোধ কেবল একটি রাজনৈতিক অবস্থান ছিল না; বরং তা ছিল ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাঁর নেতৃত্ব ছিল এমন এক দিকনির্দেশনা, যা তাওহিদি চেতনার উপর দাঁড়িয়ে সমাজের শোষিত মানুষের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানাত। এই সংগ্রামের সফল পরিণতিতে বীর কামালের পতন ঘটে। এর মাধ্যমে শুধু একটি ক্ষমতাকাঠামোর পতন হয়নি, বরং সমাজের ভিতরে একটি নৈতিক রূপান্তর শুরু হয়, যেখানে জুলুমের জায়গায় ইনসাফ, ভয়ে ভয়ে বাঁচার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাসী অবস্থান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বিজয়ের পর অসংখ্য মানুষ শাহ ওমরের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন। তাঁর দরবার হয়ে ওঠে এক আত্মরক্ষামূলক আশ্রয়স্থল, যেখানে মজলুম মানুষ কেবল দান বা দোয়া নয়; আত্মবিশ্বাস ও মানবিক মর্যাদা ফিরে পেতে শুরু করে। চকরিয়ার যেই স্থানে শাহ ওমর ইন্তিকাল করেন, সেটি পরে "উমরাবাদ" নামে পরিচিতি পায়। এই নাম এখনো রুহানিয়ত ও ইনসাফভিত্তিক সেই সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে।[৯] কবি মুহাম্মদ খানের মাতুল, ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিমের গবেষণা এবং আঞ্চলিক লোকসাহিত্য– এসব কিছুর মধ্যেই শাহ ওমরের সংগ্রামী ও আধ্যাত্মিক অবস্থান 'দাওয়াজদাহ আউলিয়া'-এর একজন হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এই প্রতিরোধ-পর্বগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং এক সুসংঘবদ্ধ সুফি নেটওয়ার্কের অংশ, যার ভিতরে জড়িয়ে আছে ইনসাফ, তাওহিদ, জুলুমের বিরোধিতা ও আত্মশক্তি নির্মাণের এক ধারাবাহিক আন্দোলন। এই নেটওয়ার্ককে বোঝা জরুরি, কারণ এখানেই চট্টগ্রামের

---

[৩] ড. আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ১৯৭০, পৃ ৩৫-৩৮

[৪] ওহিদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, বইঘর, ১৯৮৯, পৃ: ২৪

[৫] আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামি ফাউন্ডেশন, ২০০২, পৃ: ১১৭

[৬] 'কাতাল পীর' উপাধিটি শুধু সহিংসতা নির্দেশ করে না, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থানের প্রতীকী রূপ–যা প্রাক-মোঘল বাংলার মুসলিম ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক দৃষ্টান্ত গড়ে তোলে।

[৭] গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সুফি সাধক*, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ: ১১৯

[৮] ড. মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা, *চট্টগ্রামের সুফি সাধক দরগাহ*, অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ: ৫৬

[৯] প্রাগুক্ত পৃ: ৭২-৭৪

মুসলমানদের ঐতিহাসিক ভিত নির্মিত। এই ধারার অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন- শাহ জালালুদ্দিন মাহি আছোয়ার (১৩০৭- ১৩৮৩), শায়খ শরীফ উদ্দিন, হজরত শাহজাহান শাহ (রহ.) ইত্যাদি। এবং তার পুরো গোষ্ঠী:

১. দারওয়াজদাহ আউলিয়া (বারো আউলিয়া): চট্টগ্রামের সুফি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও জুলুম-প্রতিরোধের প্রথম সারির সংগঠকগণ।
২. পীর পঞ্জা (পাঁচ পীর)
৩. চেহল আবদাল (চল্লিশ আবদাল)
৪. চাহার পীর (চার পীর)
৫. জুমলা আউলিয়া (সকল আউলিয়া)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত আরবি পাণ্ডুলিপি,[১০] স্থানীয় ফোক বয়ান ও মাজার-সংক্রান্ত তথ্য এই সুফি নেটওয়ার্ক ও তাঁদের কাজকে পুনর্পাঠ করার জন্য এক মূল্যবান উৎসভাণ্ডার। এই সমস্ত ধারাবাহিকতা আমাদের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে। যখন আমরা চট্টগ্রামের 'জুলাই অভ্যুত্থান'র নৈতিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক রূপরেখা অনুসন্ধান করব, তখন চট্টগ্রামের সুফিদের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস কেবল অতীত নয়, বরং ঐতিহ্য হিসেবে পাঠযোগ্য হবে।

## দ্বিতীয় পর্ব (মোঘল আমল)

**প্রেক্ষাপট:** ষোড়শ শতকের সূচনালগ্নে চট্টগ্রামের ইতিহাস এক ভয়াবহ সামুদ্রিক সংকটের ভিতরে প্রবেশ করে। গোয়া ও মালাবার উপকূল থেকে আগত পর্তুগিজ উপনিবেশবাদীরা 'বাণিজ্য' নামক এক সাদা ছায়া নিয়ে চট্টগ্রামে অবতরণ করে। তাদের এই আগমন শুধু একটি নতুন বাণিজ্যপথের উন্মোচন নয়; বরং উপকূলজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা, দাসব্যবসা, জলদস্যুতা এবং ইসলামি জনপদের বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত ধর্মীয় নিপীড়নের সূচনা করে। এই 'সামুদ্রিক সাম্রাজ্যবাদ' কেবল বাইরের শত্রুদের আগ্রাসন নয়, বরং উপস্থিত হয় এক ত্রিমাত্রিক শোষণব্যবস্থা হিসেবে।

- রাজনৈতিক: আরাকান ও ত্রিপুরার শক্তিগুলো চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে এর নিয়ন্ত্রণ দখলের অপচেষ্টা চালায়।
- অর্থনৈতিক: বন্দর ও সমুদ্রপথ দখলের জন্য শুরু হয় এক নির্মম প্রতিযোগিতা ও লুটতরাজ।
- ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক: মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের উপর চলে ধারাবাহিক ধর্মীয় নিপীড়ন এবং সুফি কাঠামো ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রসমূহ ধ্বংস করার অপচেষ্টা।

এই সংকটকাল প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে চলমান থাকে। হোসেন শাহ থেকে শুরু করে নসরত শাহ ও অন্যান্য শাসকগণ একাধারে রাজনৈতিক দুর্বলতা, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন এবং প্রশাসনিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামকে আরও অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেন। এর ফলে উপকূলজুড়ে মুসলিম জনজীবন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ভাঙনের মধ্যে সুফি দরবারসমূহ রূপ নেয় একমাত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থলে; যেখানে নিপীড়িত জনগণ স্বস্তি খোঁজে এবং ইনসাফভিত্তিক বিকল্প এক নৈতিকতা ও রুহানিয়ত চর্চিত হতে থাকে।[১১]

**বুজুর্গ উমেদ খাঁ:** সপ্তদশ শতকের শেষভাগে চট্টগ্রামের দীর্ঘমেয়াদি সংকটের অবসান ঘটাতে এগিয়ে আসেন শায়েস্তা খাঁর পুত্র মুঘল সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খাঁ। তিনি চট্টগ্রামে আগমন করেন একটি ইনসাফভিত্তিক নতুন শাসনের ভিত্তি স্থাপনের জন্য। তাঁর নেতৃত্বে মগ-আরাকানি জলদস্যু এবং পর্তুগিজ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে; যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে কুমিরা উপকূল, আন্দরকিল্লা (তৎকালীন চাটগাঁ কিল্লা) থেকে শুরু করে কক্সবাজারের রামু পর্যন্ত। এই যুদ্ধ কেবল ভূখণ্ড পুনর্দখলের জন্য ছিল না; বরং এর অন্তরে ছিল এক নতুন মূল্যবোধের চর্চা। যুদ্ধের শুরুতেই উমেদ খাঁ সৈন্যদের নির্দেশ দেন– "কেউ যেন লুটতরাজ না করে, কারও উপর জুলুম না চালায়।"[১২] এটি সাধারণ নির্দেশ নয়, বরং তা এক ধরনের রুহানিয়তভিত্তিক সামরিক শৃঙ্খলা. যেখানে যুদ্ধ হয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ইনসাফের পথ ধরে। এইভাবে যুদ্ধ হয়তো রক্তাক্ত ছিল, কিন্তু তার মূল ভিত্তি ছিল ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পরিশেষে দুই হাজার আরাকানি বন্দি হয়, পর্তুগিজদের বিতাড়িত করা হয় এবং মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়; যেখানে বাহ্যিক বিজয়ের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল নৈতিক রূপান্তর। উমেদ খাঁ এই পরিবর্তনকে স্থায়ী রূপ দিতে চট্টগ্রামের নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ'। এটি নিছক প্রশাসনিক নাম ছিল না; বরং এর প্রতীকী ঘোষণা– 'সাম্রাজ্যিক নৈরাজ্য থেকে ইনসাফভিত্তিক শৃঙ্খলার পথে প্রত্যাবর্তন'। এই সময়েই নির্মিত হয় "জামে সংগীন"– বর্তমান আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ। যা একাধারে ছিল মুঘল উপস্থিতির চিহ্ন এবং জনসমাজের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র।[১৩]

---

[১০] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪-৭২

[১১] চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্ম তত্ত্বনিধি, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, মান্না পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ ৩৭-৪৩ ; *ইসলামাবাদ*, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বাতিঘর, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ ৩০-৩২

[১২] ওহিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১-৫৪

[১৩] সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২

মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর চট্টগ্রামের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিসরে শুরু হয় এক নতুন গতি। খানকাহ, মসজিদ, দরগাহের বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চল হয়ে ওঠে রুহানিয়তের চর্চাকেন্দ্র। এসব প্রতিষ্ঠান শুধুই নামাজ-ইবাদতের স্থান ছিল না, বরং ছিল আত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আদর্শ নাগরিক গঠনের ঘাঁটি এবং ইনসাফের রাজনৈতিক চেতনার নীরব সূতিকাগার। খানকাহগুলোয় চর্চা হতো– দয়া, সহানুভূতি, আত্মসংযম এবং ইনসাফ। এর মাধ্যমে ভাঙা সমাজচেতনা আবার জেগে ওঠে; নিপীড়িত মানুষ পায় আত্মবিশ্বাস। এই নীরব সংস্কার পরবর্তীকালে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভিত গড়ে দেয়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা সরবরাহ করে এবং আধুনিক গণজাগরণেও ছায়ার মতো উপস্থিত থাকে। যা বাহ্যিক নয়, বরং অন্তর্জাগতিক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

## তৃতীয় পর্ব (ব্রিটিশ আমল)

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে চট্টগ্রাম এক নতুন ঔপনিবেশিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এই অঞ্চলকে শুধু ভৌগোলিকভাবে দখল করে না; বরং এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও ধর্ম-সংস্কৃতির শিকড়েও হস্তক্ষেপ করে। বন্দরনগরীর কৌশলগত গুরুত্বকে ঘিরে ব্রিটিশরা এক পরিকল্পিত কার্যক্রম শুরু করে, যার ফলে কৃষক, প্রজা, আলেম-দরবেশ প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে জুলুম, নিপীড়ন ও বঞ্চনার মুখোমুখি হন। জমি দখল, খাজনার বোঝা, ইসলামি শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ– সব মিলিয়ে এ ছিল এক বৃহৎ ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়া।[১৪] উপনিবেশবাদের এই নিঃশব্দ আঘাত ভারতবর্ষজুড়ে এক বিকল্প মুক্তিসংগ্রামের জন্ম দেয়। এ সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক ছিল না, বরং ছিল আত্মিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণেরও একটি প্রয়াস। চট্টগ্রামও সেই ঢেউ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এখানকার সুফি-সাধক, আলেম ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এক ধরনের আন্দোলনের সূচনা করেন, যা উপনিবেশবাদের দেহগত এবং মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক নীরব বিপ্লব।

**সুফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী:** এই আধ্যাত্মিক জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হলেন হজরত সুফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রহ.) (১৭৭৮-১৮৫৮)। মিরসরাইয়ে জন্ম নেওয়া এই সাধকের পরিচয় বহুমাত্রিক। তিনি একাধারে আলেম, মুজাহিদ, সুফি, সংগঠক এবং আত্মিক জাগরণের নির্মাতা। তাঁর রুহানিয়ত কেবল ভক্তির অনুশীলন নয়; বরং তা ছিল জুলুমের বিরুদ্ধে আত্মিক সত্তার আত্মপ্রকাশ। সাধনার অর্থ ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ, আর সংগ্রামের মানে ছিল নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক অবিচল দাঁড়িয়ে থাকা। সুফি নূর মুহাম্মদের নেতৃত্বের গভীরতা বোঝা যায় তাঁর আন্দোলনসঙ্গী ও প্রভাবিতদের নাম শুনলেই। তাঁর পাশে ছিলেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ, তিতুমীরের মতো বিপ্লবীরা। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশবিরোধী ১৮টি যুদ্ধে অংশ নেন, যার মধ্যে ১৮৩০ সালের নওশাহ যুদ্ধ এবং তাঁর সেনাপতিত্বে পরিচালিত বালাকোট যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে স্মরণীয়।[১৫] বালাকোটে শিখদের বিরুদ্ধে সাহসিকতায় লড়াই করে তিনি অর্জন করেন "গাজি-এ-বালাকোট" উপাধি। তাঁর নেতৃত্বে একটি সুসংগঠিত রুহানি নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে, যা বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও বার্মা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হাজার হাজার খানকাহ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। যেগুলো সমাজে নৈতিক পুনর্গঠন এবং আত্মপরিচয়ের জাগরণে ভূমিকা রাখে।[১৬] ঔপনিবেশিক বিভাজনকামী নীতির বিপরীতে নূর মুহাম্মদের তরিকতভিত্তিক আন্দোলন এক রুহানিয়তসমৃদ্ধ আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণ করে। এজন্য অনেক ইতিহাসবিদ তাঁকে 'বঙ্গপীর' উপাধিতে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি'র ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা এবং ব্রিটিশ ও শিখবিরোধী প্রতিটি জিহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। বালাকোট যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি কলকাতায় প্রায় নয় বছর কাটান, এরপর ১৮৪০ সালে নিজ জন্মভূমি মিরসরাইয়ে ফিরে আসেন এবং এখানেই তাঁর জীবনের শেষ ১৮ বছর অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি শুধু আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত ছিলেন না, বরং রুহানিয়তকে এক উপনিবেশবিরোধী আদর্শে রূপান্তরিত করে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে থাকেন।[১৭]

**মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকী:** চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঞ্চলে উপনিবেশবিরোধী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল মুখ হলেন মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকী। তিনি ছিলেন এমন এক মুজাহিদ সুফি, যিনি সরাসরি সৈয়দ আহমদ শহীদ'র হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং বালাকোটের ঐতিহাসিক যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সংগ্রাম কেবল চট্টগ্রামকে ঘিরেই ছিল না; বরং তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, গাজী ইমামুদ্দিন বাঙালির (১৭৭৮–১৮৫৯) ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে। বালাকোট যুদ্ধ শেষে তিনি ফিরে আসেন চট্টগ্রামে। এখানেই শুরু হয় তাঁর আত্মত্যাগে ভরপুর আরেকটি যাত্রা, যেখানে সমাজ সংস্কার, কুসংস্কারের বিরোধিতা, ইসলামি শিক্ষা বিস্তার এবং ব্রিটিশবিরোধী সচেতনতা গড়ার লক্ষ্যে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চুনতির হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা (১৮১০) আজও সেই সংগ্রামী চেতনার এক জীবন্ত স্মারক। তাঁর চিন্তা ও কর্মে ফুটে ওঠে এক 'রিফর্মিস্ট সুফিবাদ'– যা সমাজের গভীরে গিয়ে প্রজাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা, শিক্ষা এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করে।[১৮]

---

[১৪] ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২, পৃ: ২৭১-৩০৬ ; সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১-৬৫

[১৫] মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ মিয়া, *সীরাতে সূফী নুর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)*, ২০২২ পৃ. ১৫৯-১৬৪

[১৬] হামিদ উল্লাহ খান, *আহাদিসুল খাওয়ানিন*, কলকাতা, ১৮৩১, পৃ: ৩১৮

[১৭] শেহাবুল হুদা, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩১-১৪৯

[১৮] শরীফ মুহাম্মদ, *বিপ্লবীর চুনতি মাওলানা আবদুল হাকিম*, দৈনিক আমার দেশ, ২৮ মার্চ-২০১৩

## চতুর্থ পর্ব (পাকিস্তান আমল ও মুক্তিযুদ্ধ)

৪৭ সালে এই অঞ্চলের মানুষ হাসিল করে আজাদি–পাকিস্তান রাষ্ট্র, যা পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য পরবর্তিতে জুলুমের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। ভাষা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও প্রশাসনে ধারাবাহিক বৈষম্য ও শোষণ সৃষ্টি হয়, যা জনগণের মধ্যে গভীর হতাশার বীজ বপন করে। এই বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এক রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে, যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ইনসাফের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষিতে শুরু হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, যা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই নয়, বরং ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের এক মহান স্বপ্নের প্রকাশ। এই সংগ্রামে শুধু রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র বাহিনী নয়, দেশের দরবার-খানকাহ ও সুফি সাধকরা জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে ঐক্যবদ্ধ নৈতিক চেতনার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাদের রুহানিয়ত ও ইনসাফের ভাষ্য ছিল বিদ্যমান শোষণমূলক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সুসংগত প্রতিবাদের শক্তিশালী ধ্বনি।

**মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ও হজরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী:** মুক্তিযুদ্ধের কঠিন সময়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ ছিল একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, শান্তির বন্ধন ও সহায়তার কেন্দ্র। দরবার সংলগ্ন ময়ুরখিল গ্রামের খামারে নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান হতো। এই মহৎ কার্যক্রমের নেতৃত্বে ছিলেন মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রাণপুরুষ হজরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রহ.) এঁর পৌত্র সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহ.)। ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল দরবার শরিফের উরসে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ও বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শিত হয়, যা ছিল সাহসী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের এক বিরল নজির।[১৯] শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকসহ জাতীয় নেতারা এ দরবারের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ১৯৫২ ও ১৯৫৮ সালে শেখ মুজিব নিজেও দরবারে জিয়ারত করে দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর দোয়া কামনা করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন উন্মোচন করেন। শেষ সাক্ষাতে দেলাওর হোসেন মাইজভাণ্ডারী হুজরায় বসে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শেখ মুজিবকে পাঁচটি মূলনীতির পরামর্শ দেন, যা কালেভদ্রে ছেষট্টির ছয় দফা, ঊনসত্তরের নয় দফায় রূপ নেয়।[২০]

দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর পরামর্শে শেখ মুজিবকে যে পাঁচটি মূলনীতির[২১] কথা বলা হয়েছিল, তা ছিল–

- প্রশাসনিক, সামরিক, বিচারবিভাগসহ সকল সরকারি অফিস আদালতে বাঙালির ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ।
- আঞ্চলিক শোষণের অবসানের জন্য কার্যকরী অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুঁজে বের করা।
- ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাহেতু জনগণের জানমালের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- এসব দাবির পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য দেশের সর্বত্র সুষ্ঠু সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা।
- প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সমতাভিত্তিক ন্যায্য সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

ঐতিহাসিক ছয় দফার মধ্যে এই দর্শনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ছয় দফায় পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, আলাদা মুদ্রানীতি, পৃথক বাণিজ্য ও ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা– সবই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে নির্দেশ করে। কেন্দ্রীয় শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ, তা দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ন্যায়ভিত্তিক প্রতিরোধের উপদেশেরই রাজনৈতিক রূপান্তর, একইভাবে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব বাংলার হাতে ন্যস্ত করার দাবি সরাসরি ভৌগোলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রস্তাব, যা পীর মাইজভাণ্ডারীর তৃতীয় মূলনীতির প্রতিফলন। ফলে স্পষ্ট হয়, সুফি নেতৃত্ব ও জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে একটি গভীর সংলাপ ও বিনিময় ইতিহাসে ঘটেছিল, যা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি দিয়েছিল।

**হজরত কারি তৈয়ব শাহ (রহ.):** সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটির পুত্র, পশ্চিম পাকিস্তানের দরবারে সিরিকোটের প্রতিনিধি হিসেবে হজরত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ.) ১৯৫৮ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়মিত আগমন করতেন। চট্টগ্রামের বলুয়ার দিঘীর পাড়স্থ খানেকাহ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া এবং ষোলশহরের আলমগীর খানেকাহ-এ তৈয়্যবিয়ার প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আস্তানা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রধান শেখ আহমদ নুরানির মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার তথা শাসক ইয়াহিয়া খানের নিকট একটি শান্তিবার্তা প্রেরণ করেন। বার্তাটি ছিল: পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চলমান দমননীতি বন্ধ করে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান।[২২] যুদ্ধকালীন তিনি বিশেষভাবে বাংলাদেশি মুরিদদের জন্য "বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু..."[২৩] নামক দোয়ার আমল

---

[১৯] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *মাইজভান্ডার সন্দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ: ২৮৩

[২০] মোঃ মাহবুব উল আলম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ*, আলোকধারা বুকস, ২০১৪

[২১] জামাল আহমদ সিকদার, আলোকধারা পত্রিকায় প্রকাশিত "মাইজভান্ডারী করুণাধারা: মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি" শীর্ষক নিবন্ধের বরাতে: মোঃ মাহবুব উল আলম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ*, আলোকধারা বুকস, ২০১৪, পৃ: ৩৩

[২২] মোহাম্মদ অসিউর রহমান, *সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ জীবনী গ্রন্থ*, সাকলাইন প্রকাশন, আগস্ট ২০২০, পৃ: ৯২.

[২৩] "বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআ ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস সামীউল আলীম"।।

প্রচলন করেন, যা হাদিসের আলোকে শান্তি, নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। এই আত্মিক নির্দেশনা যুদ্ধকালীন মানুষের হৃদয়ে সাহস, ভরসা ও বিশ্বাসের আলো জ্বালায়। তার অন্তর্দৃষ্টি পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত প্রদান করেছিল, যা তাঁর অনুসারীরা আজও স্মরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হতো, যাতে শান্তি কমিটি বা স্বাধীনতা বিরোধী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ যুক্ত না হয়; এর বিরুদ্ধাচরণে শিক্ষার্থীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো।[২৪]

পাকিস্তানি শাসনের বৈষম্যমূলক নীতি ও ঔপনিবেশিক মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামের খানকাহ ও সুফি দরবারগুলো শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা জনতার মধ্যে আত্মপরিচয়ের পুনর্গঠন, ইনসাফবোধের জাগরণ ও সামাজিক প্রতিরোধচেতনার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারা এক নীরব মুক্তির স্বপ্ন বুনে দিয়েছিলেন, যা সময়ের এক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদের নৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

## জুলাই অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পরম্পরা

বাংলার মাটিতে আত্মিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের যে ধারাবাহিক ঐতিহ্য বহমান, ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান তার আধুনিক ও কার্যকরী এক প্রতিফলন। এই সংগ্রাম কেবল প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বিদ্রোহ নয়, এটি এক রুহানিয়তভিত্তিক প্রতিরোধচেতনার প্রকাশ, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার সুফি ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল। ইতিহাসে এই ধারার প্রথম প্রকাশ স্পষ্ট হয় চট্টগ্রামের কাতাল খান গাজী, পীর বদর আউলিয়া, শাহ ওমর সহ 'বারো আউলিয়া'র সংগ্রামে। পরে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী ও অন্যান্য চরিত্র এই ঐতিহ্য পুনঃউচ্চারিত করেন। আজকের দিনে চট্টগ্রামের ছাত্র-জনতা এই ঐতিহাসিক পরম্পরায় নবজীবন এনে এক আধ্যাত্মিক ইনসাফভিত্তিক রাজনীতির সূচনা করেছে।

প্রথম স্তরে যেমন শাহ ওমর চকরিয়ায় স্থানীয় স্বৈরশাসক বীর কামালের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, তেমনি ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে চট্টগ্রামের ছাত্র-জনতা স্থানীয় স্বৈরশাসন, পুঁজিবাদী সিন্ডিকেট, প্রশাসনিক অত্যাচার ও আধিপত্যবাদী শক্তির নির্ভরতার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই সময়ের ক্ষমতাসীন আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র– যারা শোষণ, নিপীড়ন ও দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ নগর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রতিরোধ নির্মাণ করে। তারা জানত, এটি শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই নয়; এটি নৈতিক কর্তৃত্ব ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দাবি। আর তাই এই আন্দোলনের ভাষা ছিল ইনসাফের, স্লোগান ছিল ইনসাফের, লক্ষ্য ছিল ইনসাফ। ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আবারও প্রমাণিত হয়– জুলুমের বিরুদ্ধে ইনসাফই বিজয়ী।

চট্টগ্রামের সংগ্রামী ইতিহাস কখনোই অভ্যন্তরীণ শোষণের সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং বহিঃশত্রু আগ্রাসন ও দমনমূলক শোষণের লক্ষ্যে চতুর্দশ শতকে আরাকানির সহায়তায় স্থানীয় মগ শ্রেণি হাজার হাজার মানুষকে বিদেশি দাসবাজারে বিক্রি করে, বাণিজ্যপথ ধ্বংস করে। কাতাল খান গাজী সেই সময়ে আরাকানি ও মগদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ষোড়শ শতকে পর্তুগিজ জলদস্যুরা 'বাণিজ্যের' আড়ালে প্রবেশ করে দেশি সম্পদ পাচার ও জনগণকে শোষণ করে। বুজুর্গ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে এই আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের সময় মাওলানা আবদুল লতিফ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মতো সুফি সাধকেরা আত্মিক ও সশস্ত্র স্বাধীনতার ডাক দেন। তারা জাতির আত্মপরিচয় ও অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। তাঁদের প্রতিরোধ কখনো সশস্ত্র, কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক। কিন্তু লক্ষ্য এক– বহিঃশত্রুর শোষণ বন্ধ করা ও জনমর্যাদা রক্ষা করা।

২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান সেই একই প্রতিরোধচেতনার আধুনিক সংস্করণ। চট্টগ্রামের ছাত্র-জনতা তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পেছনে থাকা দিল্লি-সংশ্লিষ্ট আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেয়। তারা বুঝেছিল, আধুনিক যুগের বহিঃশত্রু হল 'অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ', বহুজাতিক করপোরেট সিন্ডিকেট, রাষ্ট্রের ভিতরে বিদেশি স্বার্থে কাজ করা আমলাতন্ত্র। ক্ষমতাসীন দলীয় দুর্নীতি ও শোষণকে তারা এক কথায় বর্ণনা করল– 'জুলুম'। আর জুলুমের জবাবও তারা দেয় ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত একটি দর্শনে: ইনসাফ। রাজপথে উচ্চারিত হয়েছিল সাহসী স্লোগান: "দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা" "ভারতীয় আগ্রাসন, রুখে দাও জনগণ" "ভারত ভারত করিস না, পিঠের চামড়া থাকবে না।" এসব

---

অর্থ - মহা পবিত্র সত্তা ঐ আল্লাহ্র নামে শুরু করলাম, যাঁর নামের বদৌলতে জমিনে বা আসমানে কোন বস্তুর (মানব, জ্বীন বা শয়তান এর) ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নাই। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

উপকারীতা– পবিত্র গ্রন্থ "মিশকাত শরীফ" এ বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ দোয়া সকালে তিন বার এবং সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে, কোন শত্রুই তার কোন রকম অনিষ্ট করতে পারবে না"।

[২৪] মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ রাঃ জীবন ও কর্ম*, আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি, ১৯৯৩

স্লোগান কেবল প্রতীকী নয়; বরং বাংলার জনগণের আত্মিক অধিকার, রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায়বিচারের দাবি– যা বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ শতাব্দীর সংগ্রামের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার বহন করে।

জুলাই অভ্যুত্থানের অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল একটি গভীর নৈতিক ঐক্য– যার ভিত্তি জাতিগত ঘৃণা বা প্রতিশোধ নয়, বরং ইনসাফ। এই আন্দোলনের বিশেষত্ব এখানেই যে, এটি কেবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নয়, বরং জুলুমের যাবতীয় রূপ ও উৎসের বিরুদ্ধে এক আত্মিক জাগরণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে– যে প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা বাহ্যিক অস্ত্রশক্তির উপর নয়, আত্মিক দৃঢ়তা ও নৈতিক স্থিতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। চট্টগ্রামের ছাত্র-জনতা সেই ইতিহাস-নির্মাতা উত্তরাধিকারকে ধারণ করে আবারও দেখিয়েছে– ইনসাফই এই জাতির সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দাবি। তাদের প্রতিরোধ ছিল রাজনৈতিক মাত্রায় সুসংগঠিত, কিন্তু তার উৎস ছিল আধ্যাত্মিকতায় প্রোথিত। কারণ তারা কেবল রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলাতে চায়নি, চেয়েছে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলাতে। তারা এমন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছে, যেখানে নাগরিক মর্যাদা শুধু সাংবিধানিক অধিকার নয়; বরং ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেখানে ইনসাফ কায়েম হয় আল্লাহর খিলাফতের অনুভূতি থেকে। এই আত্মিক উপলব্ধিই তাদের রাজপথে নামায়– পরিবার, নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে একটি বৃহত্তর নৈতিক সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে। তাদের আত্মা নফসের দাসত্বে আবদ্ধ নয়, বরং উচ্চতর এক সত্যের অনুসারী। সেই সত্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এক নতুন প্রজন্ম, যারা আর ভোগবাদী ভিন্নমতচর্চায় আটকে থাকতে চায় না। বরং তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, রুহানিয়তনির্ভর রাজনীতিই মানবিক ন্যায়বোধের প্রকৃত পরিণতি। এই রাজনীতিতে কর্তৃত্ব আসে জনগণের সম্মিলিত জিকির থেকে, বিবেকের আলো থেকে এবং ইনসাফ-চর্চা থেকে, উপরের চাপিয়ে দেওয়া আদেশ-নির্দেশ থেকে নয়। তারা বুঝে নিয়েছে: ন্যায়ের মর্মবাণী কোনো আলংকারিক বক্তব্য নয়, বরং তা জীবন্ত এক রাজনৈতিক শক্তি, যা মানুষকে দাঁড় করায় সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে, এবং ইতিহাসে বারবার সত্যকেই বিজয়ী করে। তাদের চোখে ভাসানীর হুঁশিয়ারি নতুন ভাষায় পুনর্জন্ম লাভ করে, আবুল হাশিমের রুহানিয়ত পায় নতুন কাঠামো, এবং শতাব্দীপ্রাচীন সুফি-সমাজের প্রতিরোধ-সংগ্রাম এক নবীন পরিসরে ফিরে আসে নতুন প্রজন্মের হাতে। এই পুনর্জাগরণ কেবল রাজনৈতিক পালাবদলের আহ্বান নয়, বরং এক গভীর আত্মিক বিপ্লব; যার সূচনা ইনসাফের আহ্বানে, যার ধারা এখনো বহমান।

**উপসংহার:** চট্টগ্রামের সুফি সংগ্রামী ঐতিহ্য ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন কাহিনি নয়; বরং জালেম প্রতিরোধের এক নৈতিক ধারাবাহিকতা, যা যুগে যুগে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান সেই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ উজ্জ্বল নিদর্শন– যেখানে আধ্যাত্মিকতা, ইনসাফবোধ, এবং সামাজিক প্রতিরোধ এক নবতর সম্মিলনে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিরোধ কেবল বিদ্যমান শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা ছিল না, বরং তা ছিল মানুষের আত্মমর্যাদা, ন্যায্যতা, ও সম্মানের পক্ষে দাঁড়ানোর সংগ্রাম। ইতিহাস এখানে কেবল অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ইশারা। এই সুফি ঐতিহ্য কোনো আধুনিক জাতীয় প্রকল্পে গলিয়ে ফেলা যাবে না, আবার এটিকে কেবল আঞ্চলিকতা বলেও সীমিত করা যাবে না। বরং এটি এক রুহানিয়তভিত্তিক ন্যায়বোধের অব্যাহত ধারা– যা যে-কোনো যুগে, যে-কোনো ভূগোলে নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের আত্মমর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জোগাতে সক্ষম। সঠিকভাবে লালন ও চর্চা করলে এই চেতনা ভবিষ্যতের সমাজ বিনির্মাণেও এক নৈতিক বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করবে।

**গ্রন্থপঞ্জি**


১. ড. আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ১৯৭০
২. ওহিদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, বইঘর ১৯৮৯
৩. গোলাম সাকলাইন, *বাংলাদেশের সুফি সাধক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৩
৪. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০২
৫. ড. মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা, *চট্টগ্রামের সুফি সাধক দরগাহ*, অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৯
৬. আকবর আলি খান, *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, আমিনুল ইসলাম ভুইয়া অনুদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪
৭. হামিদ উল্লাহ খান, *আহাদিসুল খাওয়ানিন*, কলকাতা, ১৮৩১
৮. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্ম তত্ত্বনিধি, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, মান্না পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর ২০০০
৯. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২
১০. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, *ইসলামাবাদ*, বাতিঘর, ডিসেম্বর ২০১৯
১১. ড. এনামুল হক, *বঙ্গে সুফি প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
১২. *The Rise of Islam and Bengal Frontier*, 1204-1760: Richard M. Eaton, University of California Press, London, 1993
১৩. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ মিয়া, *সীরাতে সূফী নুর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)*, হাজী প্রকাশনী, ২০২২
১৪. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ রাঃ, জীবন ও কর্ম*, আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৩
১৫. মোঃ মাহবুব উল আলম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ*, আলোকধারা বুকস, ২০১৪
১৬. শরীফ মুহাম্মদ, *বিপ্লবীর চুনতি মাওলানা আবদুল হাকিম*, দৈনিক আমার দেশ, ২৮ মার্চ ১৩'
১৭. ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯
১৮. মোহাম্মদ অসিউর রহমান, *সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ জীবনী গ্রন্থ*, সাকলাইন প্রকাশন, আগস্ট ২০২০